

গোত্রবদ্ধ মমাজ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র

নীলান্ত বসেছে জানালার পাশের একটা সিটে। জানালা দিয়ে সে মুক্ত আকাশে এক ঝাঁক পাখির বাঁধাহীন উড়ে চলা দেখছে। অশ্বেষা ওর পাশে এসে বসলো। নীলান্ত ফিরেও তাকালো না।

অশ্বেষা জানতে চাইলো, কী রে, কী দেখছিস?

নীলান্ত চমকে উঠে ফিরে তাকায়। আনমনে উত্তর দিলো, খোলা আকাশ, মেঘের দেশ আর পাখিদের উড়াউড়ি দেখছি আর ভাবছি গতরাতে দাদুর মুখে শোনা ডালিমকুমারের গল্প।

অশ্বেষা বলে, ডালিমকুমারের গল্প আমিও শুনেছি বহুবার। রাজার ছেলে ডালিমকুমার। বিশাল তাদের রাজ্য। হাতিশালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া। এতো এতো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যায়। বন্দী এক রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে।

নীলান্ত তখনো ভাবনার জগতে বিচরণ করছে। অশ্বেষার কাছে সে জানতে চাইলো, আগের দিনে সত্যিই কি এমন রাজা ছিল? রাজ্য এবং রাজকুমার ছিল? এখনও কি আছে? ডালিমকুমারের গল্প কি সত্যি?

পেছন থেকে ওদের আরেক বন্ধু সন্ধান হা হা করে হেসে উঠে বললো, তুই কি রাজকুমার হতে চাস নীলান্ত?

নীলান্ত হাসিতে যোগ দেয় না। আগের মতোই আনমনে বলে উঠে, না।

অশ্বেষা এবার নীলান্তকে বলে, খুশি আপা ক্লাস নেবেন আমাদের। আপা সব জানেন। তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবো সব সত্য। আমারও জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এখন। অনেক আগে আমাদের এই দেশ কি রাজারা চালাতো? সেই রাজারা কেমন মানুষ ছিল? এতো এতো হাতি আর ঘোড়া নিয়ে সত্যি সত্যি তারা যুদ্ধ করতো? তাদের রাজ্যে সাধারণ প্রজারাই বা কেমন ছিল?

সত্যিই কি তারা ছিল, নাকি আমরা যেসব গল্প শুনি তা সবই মানুষের মনগড়া কিংবা রূপকথা?

ওদের কথা শুনে ক্লাসের অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে ফিরে তাকায়। তারাও এ-বিষয়ে এখন জানতে চায়। খুশি আপা ক্লাসে আসার পর নীলান্ত সবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে প্রশ্নগুলো করলো। প্রশ্ন শুনে খুশি আপা মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, মানুষের মুখে মুখে এমন অনেক গল্প ছড়িয়ে থাকে যার কিছুটা হয়তো সত্য, আর কিছুটা হয়তো একেবারেই কাল্পনিক। তবে তোমরা যদি সত্যিই জানতে চাও মানুষের অতীতকালের কথা, তবে তা জানতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে। জেনে রেখো, ইতিহাস আর রূপকথা কিন্তু এক নয়। রূপকথা হচ্ছে মানুষের মনগড়া কল্পকাহিনী। আর ইতিহাস হচ্ছে মানুষের অতীতের অভিজ্ঞতা। পৃথিবীতে আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী ছাড়াও অনেক অনেক বছর আগে ছিলেন তাদেরও পূর্বসূরীরা। এই যে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরীরা এই পৃথিবীতে ছিলেন, তাদের কাজ, কর্মকাণ্ড বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন আমরা নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের আলোকে জানার চেষ্টা করবো তখনই তা ইতিহাস হয়ে উঠবে। ইতিহাস কেবল রাজকুমার, রাজা বা রাজ্যের বর্ণনা নয়। ইতিহাস খুবই আনন্দদায়ক পাঠ। মানুষ লক্ষ কোটি বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তা ইতিহাস পড়ে জানা যায়। জানা যায়, আদি যুগে মানুষ কেমন ছিল, কীভাবে তারা অরণ্যে ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু শিকার

করতো। নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে ছোট ছোট দল থেকে আস্তে আস্তে কীভাবে তারা গোত্র গড়ে তুলেছিল।

রেনু জানতে চায়, গোত্র কী আপা?

আপা বললেন, লক্ষ কোটি বছর আগে মানুষ আজকের মতো অবস্থায় ছিল না, আজকের দিনের সব অভিজ্ঞতাই ছিল তাদের কাছে অজানা। তারা বর্তমান মানুষের মতো ঘরবাড়ি তৈরি করতে জানতো না। দীর্ঘদিনের জন্যে কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হয় সেই পদ্ধতি জানতো না। খাদ্য উৎপাদনও করতে পারতো না। বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন পশু শিকার আর ফলফলাদি সংগ্রহ করে জীবন-ধারণ করতো। গুহার মধ্যে আশ্রয় নিতো। তবে আশ্রয় নেবার মতো গুহা সবখানে ছিল না। মানুষ বনের হিংস্র জীব-জন্তুর সাথে লড়াই করে এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকতো। এই বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা ছোট-বড় দল গঠন করে একসাথে ঘুরে বেড়াতো, খাদ্য সংগ্রহ করতো। এই দলকেই বলা হয় গোত্র। প্রতিটা গোত্রে দলপতি হিসেবে একজন বয়স্ক মানুষ থাকতেন। দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে তিনি মীমাংসা করতেন। দলের সবাই ঠিকমতো খাদ্য ও নিরাপত্তা পাচ্ছে কিনা দেখতেন। বড়রা যখন শিকারে যেতো, ছোটরা কোথায় থাকবে, কে তাদের পাহারা দিবে এইসব বিষয় তিনিই ঠিক করতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ চাষাবাদ করার কৌশল জানতো না। শিকারের অস্ত্রও ছিল ভোঁতা। বিভিন্ন বনের দাবানল, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদগীরণ দেখে দেখে মানুষ ক্রমেই আগুন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাথরে পাথর ঘষে তারা আগুন জ্বালানোর কৌশল রপ্ত করে নেয়। তারা বুঝতে পারে, আগুন শীতের রাতে উত্তাপ, রাতের অন্ধকারে আলো দেয়। বন্য জীব-জন্তু আগুন দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। আগুনে পোড়ালে খাবারের স্বাদ বেড়ে যায়। এইসব দেখে দেখে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে আগুনের ব্যবহার শেখে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আগুন ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ও আশ্রয়। আদিম পৃথিবীতে মানুষের জীবন ছিল খুবই ধীর গতিসম্পন্ন। প্রকৃতিতে যা কিছুই তারা দেখেছে, আস্তে ধীরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেগুলোকে নিজেদের কাজে লাগানোর মতো করে ব্যবহার করেছে। হাজার বছর ধরে তারা এইভাবে জীবন-যাপন করেছে, সঞ্চয় করেছে নানা অভিজ্ঞতা।

এতক্ষণ তোমরা আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ কীভাবে ধারণা লাভ করলো তা জানতে পেরেছে। এবার চলো নতুন একটি মজার বিষয় তোমাদের সাথে আলোচনা করা যাক। শুরুর সময়ে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধানতম সংগ্রামই ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। এরপর কৃষি ও চাষাবাদের কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো খাদ্য উৎপাদনের সংগ্রাম। মানুষের জীবন গেলো বদলে। জীবনে এই পরিবর্তন আনতে মানুষকে লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানুষের জীবনে প্রথম বিপ্লব (কৃষির আবিষ্কার) ঘটেছিল নারীর হাতে। পুরুষ যেতো শিকারে, আর নারী তাদের বসতির আশে-পাশে শস্য থেকে উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। শিকার করতে গিয়ে অনেক মানুষ বিষাক্ত সাপ ও পোকাকামড়ে, বন্য জীব-জন্তুর আঘাতে মারা যেতো। আবার সব সময়ই যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা যেতো তাও বলা যাবে না। প্রতিটা গোত্র এই খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই সমস্ত মেধা ও শক্তি ব্যয় করে ফেলতো। কিন্তু তারা যখন ধীরে চাষাবাদ শিখে গেলো তখন খাদ্য নিয়ে উদ্বেগ গেলো কমে। আগে যখন শিকার করতো, বনের পশু আর ফল কমে গেলে সেই জায়গা ত্যাগ করে নতুন জায়গায় চলে যেতে হতো খাদ্য সংগ্রহের আশায়। সবশেষে শিকারি ও অস্থায়ী জীবনের নিরন্তর ছুটে চলার বদলে মানুষ মোটামুটিভাবে একটি স্থানে স্থায়ী হতে শুরু করে। গোত্রীয় ব্যবস্থা এভাবেই এগিয়ে চলে। পশু শিকার থেকে পশু পালন শুরু হয়, চাকার আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি, আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে মানুষ প্রথম শিকার জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও চাষাবাদ করতে শুরু করেছিল। কৃষি কাজ বা চাষাবাদ শুরু করা ছিল মানুষের ইতিহাসে প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিহাসের আলোচনায় এই সময়টাকে

তাই 'কৃষি বিপ্লব'-এর সময় বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এতক্ষণ তোমরা মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা মজুদ করাও শিখে যায়। মানুষ যখন খাদ্য মজুদ করে রাখা শুরু করে, তখন গোত্র ও সমাজে খাদ্য বন্টন নিয়ে দেখা দিতে শুরু করে বৈষম্য। এই বৈষম্য মানুষের টিকে থাকার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। যে গোত্র যতো বেশি খাদ্য/ সম্পদ মজুদ করতে থাকে, মানুষের উপর তাদের ততো বেশি ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। খাদ্য মজুদ করেই একশ্রেণীর মানুষ অভিজাত হয়ে ওঠে এবং অপরাপর সাধারণ মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে শুরু করে।

কৃষি বিপ্লবের পর আসে নগর বিপ্লব। এই সময় থেকে মানুষ অক্ষরের আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে শুরু করে। মানুষের কর্মকাণ্ডের লিখিত দলিল তৈরি হয়। এই সময় থেকেই ইতিহাসে নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন। নগরগুলোতে রাজা, রাজপরিবার, এবং তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির জন্ম হয় যারা তৎকালীন সময়ের সুবিধাভোগী বাছাইকৃত একটি অংশ। তোমরা এটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, এই বাছাইকৃত অংশে তারা স্থান পেয়েছে তাদের সম্পদ, শক্তি ও ক্ষমতার বিবেচনায় যেখানে সাধারণ মানুষের কথা নেই বললেই চলে।

চলো এবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠা নগর সভ্যতা যেমন মিশরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের হরপ্পা সভ্যতার মতো আমাদের বাংলা অঞ্চলেও আদিকালে কীভাবে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তা জানা যাক। এ-সকল সভ্যতা এবং বাংলা যে একটি অঞ্চল সে সম্পর্কে তোমরা তোমাদের অনুসন্ধানী বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ভূ-প্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যার মধ্যে রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্য, এবং বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-মেঘালয় রাজ্যের অংশবিশেষ। এই ভূ-খণ্ডেই ইতিহাসের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নগর গড়েছে, বাংলা ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, কতিপয় অভিজাত শ্রেণী ভূ-খণ্ড ও মানুষ দখল করে রাজা-রাজ্য বানিয়েছে, ক্রমাগত যুদ্ধ করেছে, আবার উচ্চাভিলাষী সুবিধাবাদীদের হারিয়ে সাধারণ মানুষের জয়ও সূচিত হয়েছে। এ-রকম ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভূ-খণ্ডের পূর্বপ্রান্তের একটি রাজনৈতিক সীমানায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

এবার আমরা জানবো এই বাংলা অঞ্চলের দু/একটি নগর এবং সেই নগরকেন্দ্রিক আদিকালের সভ্যতা সম্পর্কে। বাংলার ইতিহাসে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং পুন্ড্রনগরের নাম বলা যেতে পারে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি গড়ে উঠেছিল বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশে, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-এর বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরে। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী আদি অনার্য ভাষাভাষী মানুষের হাতেই এর সূচনা। আর পুন্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, করতোয়া নদীর তীরে।

একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করে দেখবে, সেই সময় প্রতিটা বিখ্যাত নগরীই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন না কোন নদীর তীরে। নদী ছিল যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম। এই নদী পথেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নগরে পণ্য এবং মানুষ যাতায়াত করতো। নদী ও সমুদ্রপথে মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তো, চলতো ব্যবসা-বানিজ্য। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, আজ থেকে দুই-আড়াই হাজার বছর আগে বাংলার নগরগুলির সাথে ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রপথে এই বাণিজ্য যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। ইউরোপ থেকে যেসব নাবিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলায় ব্যবসা করতে আসতেন তাদের সাথে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও আসতেন। সেইসব মানুষদের লেখা পাণ্ডুলিপিও আমরা পেয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠ করে প্রাচীনকালে

বাংলা অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্লাসের সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে আপার কথা শুনছিল। খুশি আপা বললেন, এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, প্রাচীন মানুষ কীভাবে শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক যাবাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি ও নগর জীবনে প্রবেশ করেছিল। আমাদের বাংলা অঞ্চলে ইতিহাসের সূচনাকালীন সময়ের আরো বর্ণনা আমরা এখন জানতে শুরু করবো। বাংলার ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ জানার আগে প্রাচীন মানুষ নিয়ে আরও দুয়েকটা কথা তোমাদের জানাতে চাই। ইতিহাস যে বিভিন্ন প্রমাণ বা উৎসের মাধ্যমে জানতে হয় সেই বিষয়টাও তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে। এই বিষয়েও তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। যাই হোক, তোমাদের মধ্য থেকে যদি পারো কেউ একজন আমাকে বলোতো, বাংলা অঞ্চলে প্রথম কবে মানুষের বসতি শুরু হয়? সেই মানুষের কথা কীভাবে জানতে পারি আমরা?

ক্লাসের পেছনের সারিতে বসা সামিলা বললো, 'ফসিল উড'!

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ, 'ফসিল উড'!

ক্লাসের বাকি সবার দিকে তাকিয়ে আপা জানতে চাইলেন, তোমরা কি কেউ বলতে পারবে 'ফসিল উড' কী?

চার-পাঁচজন হাত উঁচু করলো।

ক্লাসের মাঝামাঝি সারিতে বসা নন্দিতার দিকে তাকিয়ে আপা বললেন, তুমি বলো তো 'ফসিল উড' কী?

নন্দিতা বললো, 'ফসিল উড' হচ্ছে এমন এক ধরনের কাঠ যা হাজার বছর ধরে প্রকৃতিতে থাকার ফলে আস্তে আস্তে পাথরের মতো কঠিন রূপ ধারণ করে। প্রাচীনকালে যে সকল এলাকায় পাথর সহজলভ্য ছিল না সেখানকার মানুষ হাতিয়ার তৈরিতে 'ফসিল উড' ব্যবহার করতো। উত্তর শুনে আপা খুবই খুশি হলেন।

নন্দিতাকে বসতে বলে তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন, ফসিল উডের আরেক নাম হচ্ছে জীবাশ্ম কাঠ। আদি কালে মানুষ জীবজন্তু শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্যে নানারকম হাতিয়ার ব্যবহার করতো। হাতিয়ার পাথরে হতো, কাঠের হতো, আবার ফসিল উডও হতো। আমাদের দেশে যেহেতু পার্বত্য ভূমি এবং পাথর নেই তাই এ অঞ্চলে মানুষ অস্ত্র হিসেবে পাথরের মতো শক্ত ফসিল উড দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে তা ব্যবহার করেছিল। মানুষের ব্যবহার করা হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের বেশ কয়টি স্থানে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। এইসব হাতিয়ার নিয়ে পণ্ডিতগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা এইসব পাথরে হাতিয়ার ব্যবহারকারী মানুষ প্রায় দশ হাজার বছর আগে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জি এবং কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতিতে কিছু ফসিল উড পাওয়া গিয়েছে যা প্রায় ১৫০০ সাধারণ পূর্বাদ্দে মানুষ ব্যবহার করতো বলে পণ্ডিতগণ গবেষণা করে জানতে পেরেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্যে তোমরা অনুসন্ধানী বই দেখতে পারো।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা অঞ্চলের ভূমি ছিল উর্বর। নদীতে ছিল প্রচুর মাছ। বনে-জংগলে ছিল নানা ফলমূল। আবার মানুষের জন্যে এখানে বেশ বিপদও ছিল। নদীতে ছিল কুমির। বনে ছিল বিষাক্ত সাপ, বাঘ, অন্যান্য হিংস্র প্রাণী ও পোকা-মাকড়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে ঝড়-তুফানও হতো বেশি। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেই টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে। বাংলার এইসব স্থানে প্রাচীন মানুষের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সবই দেখবে আশেপাশের এলাকা থেকে একটুখানি উচ্চভূমি হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে বাংলার নদীগুলো ছিল আরও বেশি প্রমত্ত। জালের মতো ছড়িয়ে

থাকা অসংখ্য নদী যেমন ছিল, তেমনই ডাঙায় ছিল ঘন অরণ্য ও জংগল। মানুষ তাই নদীর তীর ঘেঁষে বনের সীমানা ধরে উঁচু ভূমিগুলোকে বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

বন-জংগল কেটে নগর প্রতিষ্ঠার বর্ণনা কোনো রূপকথা নয়, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে মানুষের জীবনের চরম সত্য। সংস্কৃত ভাষায় লেখা মহাকাব্যগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন কালে বাংলায় রাজ্য বা রাষ্ট্র গড়ে উঠার আগেই গড়ে উঠেছিল কিছু জনপদ। সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এখানে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল নামে অনেকগুলো জনপদ ছিল। জনপদগুলোকে বলা হয়ে থাকে একেকটা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ইউনিট বা একক। ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক একক মানে হলো, জনপদগুলো ছিল একটি জনগোষ্ঠীর বসতি কিন্তু একটি থেকে আরেকটি নানাভাবে পৃথক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ভৌগোলিকভাবেও ছিল আলাদা। এদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট সীমানা বলে কিছু ছিল না। যেমন ধরো, পুন্ড্র। একটু আগেই পুন্ড্রনগরের কথা জেনেছো। বাংলার প্রাচীনতম নগর 'পুন্ড্র'। পুন্ড্র নামের মানুষেরাই ছিল পুন্ড্র জনপদের বাসিন্দা। আর তাদের নগরের নাম ছিল পুন্ড্রনগর। প্রাচীনকালে গড়ে ওঠা এই নগর বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় পড়েছে। আবার বঙ্গ নাম পরিচয়ের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বঙ্গ' জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল নিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গ জনপদ। পশ্চিমে এর সীমানা বর্তমানের কোলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কখনো কখনো। বঙ্গের পূর্বদিকে ছিল আরেকটি প্রাচীন জনপদ 'সমতট'। জনপদটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান অংশ নিয়ে। ছোট ছোট এই জনপদগুলোই ছিল বাংলা অঞ্চলের প্রথম রাজনৈতিক একক। জনপদগুলোতে যারা বাস করতেন তারা ছিলেন প্রধানত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের পাশাপাশি ছিল দ্রাবিড়, চৈনিক, তিব্বতী-বর্মী ভাষায় কথা বলা আরও দু'তিনটি ভাষাগোষ্ঠী। এরা হাজার বছর ধরে নিজেদের ভাষা, লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের মতোই জনপদ গড়ে তুলে বসবাস করছিল। যতদূর জানা যায়, এরাই ছিল বাংলার আদি বাসিন্দা। তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, বাংলা অঞ্চলের (বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য অংশ) বহু স্থানে এখনো কোল, ভিল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামের আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এইসব পূর্বসুরিদের হাত ধরেই বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাসের পথ ধরে সামনে এগিয়ে গেছে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা এখন তাহলে এতো কম কেন? এই জনগোষ্ঠীর বাইরে যে বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষ রয়েছে তাদের আগমন কখন কীভাবে হয়েছে? কী তাদের পরিচয়?

নীলান্তসহ ক্লাসের সকলে গভীর মনোযোগ দিয়ে খুশি আপার মুখে ইতিহাসের বর্ণনা শুনছিল। আপা এবার বললেন, বাংলা অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটির উপরে মানুষ বসবাস করছে। এর মধ্যে কেবল আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে ১৭ কোটির মতো মানুষ। এই মানুষের বেশিরভাগ বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি। হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা ভূ-খণ্ডে প্রবেশকারী নানান দৈহিক গড়ন ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ মিলে-মিশে বাঙালি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। এই জনগোষ্ঠীর বয়স কয়েক হাজার বছর। কিন্তু ভাষা গঠন প্রক্রিয়ার বিচারে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটিভাবে দেড় হাজার বছর।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভাগ্য অনুসন্ধান, খাবারের প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বাংলায় আগত নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জনধারার মানুষ মিলনে-বিরোধে একসাথে বসবাস করেছে। সকল মানুষের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ ঘটলেও কিছু কিছু আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের আদি সংস্কৃতি ধরে রাখতে পেরেছে। বাঙ্গালিরাও হাজার বছর ধরে তাদের ভাষা-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। জল-জংগলের প্রতিকূলতা জয় করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলা অঞ্চলের সকল মানুষ ভিন্নতর অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ভূ-খণ্ডে ইতিহাস রচনা করেছে। এই ইতিহাসে তাই ভৌগোলিক বিষয়াবলীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অশ্বেষা দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, আচ্ছা আপা বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। তার আগে এই অঞ্চলে কি রাজা, রাজ্য ছিল? যদি থাকে কী ছিল তাদের পরিচয়? তারাও কি সব সময় যুদ্ধ করতো? খাবার আর সম্পদ দখল করতো?

খুশি আপা হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের মাথায় এখনো ঘুরছে রাজপুত্র আর রাজার সেই কাহিনী। তিনি বলে চললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্নভাবে রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা আর রাজ্যের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সম্রাট, রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব উপাধীধারীরা ছিলেন তথাকথিত অভিজাত এবং নিজেদের নাম, যশ, খ্যাতি, আর গৌরব প্রচারে ব্যতিব্যস্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চাভিলাষী অভিজাত যোদ্ধাদের অনেকেই বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন, ভূখণ্ড ও সম্পদ দখল করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য না দিয়ে তাদের ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি এখানকার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন মৌর্য রাজা, গুপ্ত রাজা, সেন রাজা, খলজী রাজা, হোসেন শাহ সুলতান, নবাব মুর্শিদ কুলী খান, বৃটিশ এবং পাকিস্তানি শাসক। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বাংলা অঞ্চলের কাদা-মাটি, নদী-নালা, বিল, হাওর-বাওর, বৃষ্টি আর সবুজের ভেতর দিয়ে উঠে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলার ইতিহাসে এই ভূ-খণ্ড থেকে উঠে আসা আর কোনো নেতা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে জীবন বাজি রেখে কাজ করেন নি।

প্রাচীন কাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি কীভাবে নতুন নতুন রাজশক্তি, জনধারা, নতুন নতুন ভাষা ও ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষ এসে বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার কিছুটা ধারণা তোমরা পেয়েছো। দখলদারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে অনেকেই অবশ্য প্রতিরোধের মুখে পরেছে। এই সব অভিজাত উচ্চাকাংক্ষী মানুষের অনেক বাঁধার মুখেও এখানকার সকল মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার বছর যাবত মিলে-মিশে জীবন কাটিয়ে চলেছে। অনেক বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে সাধারণ মানুষ নিজের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি নির্মাণ করেছে।

অশ্বেষা আর নীলান্তকে লক্ষ করে খুশি আপা বললেন, তোমরা জেনেছো যে বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো গড়ে তুলেছিল প্রধানত অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চৈনিক ও তিব্বতী-বর্মী ভাষার মানুষেরা। এইসব জনপদে প্রথম বড় একটা ধাক্কা আসে যখন আর্য ভাষার মানুষেরা উত্তর ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে, ৩২৭ সাধারণ পূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার আক্রমণ করেছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছু অংশ জয় করেই তাঁর ভারত অভিযান শেষ হয়েছিল। আলেকজান্ডারের চলে যাওয়ার কিছুকাল পরেই উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে একজন সম্রাটের উত্থান হয়। তিনি মৌর্য নামে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। মৌর্যরা ছিল আর্য ভাষাভাষী অভিজাত মানুষ। আনুমানিক ৩৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। ধীরে ধীরে তারা ভারতের আদি অধিবাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে করতে পূর্ব দিকে বাংলা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মৌর্যদের আলোচনা প্রসঙ্গে আর্য ভাষা এবং এই ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে তোমাদের জানা প্রয়োজন। আর্য ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ। ভারতবর্ষে আর্যরাই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ধর্মের রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থ, নিজস্ব সংস্কৃতি। সেকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষেরা নিজ সমাজের বাইরের সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। তারা নতুন অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে প্রবলভাবে। আর্য

ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত মহাভারতে বাংলার প্রাচীন দুইটি জনপদ 'বঙ্গ' এবং 'পুন্ড্র'-এর নাম পাওয়া যায়। আর্য ভাষাভাষীদের রচিত অন্য কয়েকটি গ্রন্থে বঙ্গ এবং পুন্ড্রের মানুষদেরকে 'দস্যু', 'অসভ্য', 'নিচু' শ্রেণীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলেই কি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে এইভাবে হেয় করা যায়? সকলেই তো আমরা মানুষ। মানুষ পরিচয় সবার আগে। অভিজাত্য, ক্ষমতা এবং ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির বড়াই করে কাউকে হেয় বা অসম্মান করা একেবারেই অনুচিত। আর্য ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো সব সময়ই নিজেদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'শ্রেষ্ঠ' এবং অনার্য ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'ছোট' দৃষ্টিতে দেখেছে। অথচ এই অনার্য ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরাই বাংলা অঞ্চলে সুসংগঠিত সমাজ ও সভ্যতা রচনা করেছিল। যার প্রমাণ পাণ্ডু রাজার টিবি, যা কিছু আগেই তোমরা জেনেছো। কিন্তু তোমরা দেখবে, বাংলার দূরবর্তী ভূ-খণ্ড থেকে যখনই নতুন কোনো ভাষা, রাজশক্তি এবং ধর্ম ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তখনই সেখানকার মানুষদেরকে অনার্য বলে হেয় করেছে, অসম্মান করে তাদের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেছে। অভিজাত শ্রেণীর আর্য ভাষাভাষী কতিপয় মানুষের এই বড়াই ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের আলোচনায় ফেরত যাওয়া যাক। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক ছিলেন এই বংশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান সম্রাট। মৌর্য সম্রাটগণ বাংলার উত্তর অংশ দখল করে তাদের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন - এই খবর আমরা জানতে পেরেছি মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে। প্রাচীনকালে রাজারা তাদের আদেশ পাথরে খোদাই করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করতেন। এমনই একটি আদেশনামা পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে। শিলা বা পাথরের গায়ে লিপি খোদাই করে লেখা হতো বলেই একে আমরা শিলালিপি বলে থাকি। মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বাংলা অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বঙ্গ, পুন্ড্র প্রভৃতি জনপদ দখল করেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে সমতট পর্যন্ত গুপ্তদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আর্য ভাষার মানুষেরা এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে বাংলায় ব্যাপকভাবে তৎপরতা চালায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবী বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের লোকধর্ম চর্চার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতিতে লোকজ উপাদানের প্রভাব সব চাইতে বেশি। তারা বৃক্ষ, পাথর, আগুন ও সাপ-সহ প্রকৃতির পূজা করতো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী মানুষেরা প্রকৃতির এইসব উপাদানকে বাতিল করে নিজস্ব ধর্ম ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত উদ্যোগ নেয়। বাংলা অঞ্চলে আদি বসতি স্থাপনকারীদের অনেকেই তা মেনেও নেয়। আবার প্রাচীনকাল থেকে যেসব প্রাকৃতিক শক্তি পূজার লোকজচর্চা চলতো তাও অনেকটাই টিকে থাকে। এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে আদি অধিবাসীদের পুরনো ধর্ম-সংস্কৃতি মিলেমিশে চলতে থাকে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, মৌর্য এবং গুপ্তদের আগ্রাসনের ফলে জনপদগুলো তাদের নাম ও অস্তিত্ব হারিয়ে উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে গিয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ এক সময় দুর্বল হতে থাকে। তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। বাংলা অঞ্চলে তখন 'বঙ্গ' এবং 'গৌড়' নামে দুটি রাজ্য গড়ে ওঠে। বঙ্গ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, দ্বাদশাদিত্য এবং সমাচারদেব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে এখানে রাজত্ব করেছেন। অন্যদিকে গৌড় রাজ্যটির অবস্থান ছিলো বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান এলাকা জুড়ে। তবে হ্যাঁ, এদের সীমানা যে সব সময় একই ছিল তা কিছুতেই বলা যাবে না। রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমানাও বদল হয়ে যেতো। কখনও এইসব রাজ্যের রাজারা অভিযান চালিয়ে নতুন এলাকা দখল করেছে, আবার কখনও অন্য এলাকার রাজাদের আক্রমণের ফলে নিজ রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়েছে। গৌড়ের বিখ্যাত রাজার নাম ছিল শশাংক।

খুশি আপা প্রাচীন প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন, তোমাদের মনে রাখতে হবে, মৌর্য ও গুপ্তরা এখানে আধিপত্য বিস্তারের পর নতুন কিছু প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তুলে তাদের শাসনকাঠামো রচনা করেছিলেন। বর্তমানে যে রকম বিভাগ, জেলা, ইউনিয়ন নামে প্রশাসনিক কাঠামো তোমরা দেখতে পাও, তেমনিভাবে সেই সময়ে ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বিথী, ও গ্রাম নামে প্রায় একই ধরনের প্রশাসনিক ইউনিট। আর শাসনকাজ পরিচালনার জন্যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে সম্রাট বড় বড় যোদ্ধা এবং সেনাপতিদের পাঠাতেন। উচ্চ পদস্থ এই শাসকরা বাংলা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এদের পাশাপাশি আসতো নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি আর অনেক বিদ্বান, পুরোহিত, ব্যবসায়ী মানুষজন। রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারেও তারা কাজ করতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল চলতে থাকে। কোনো এক সময় কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে কিংবা সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা অঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। বাংলা অঞ্চলে যেসব রাজার নাম তোমরা পাবে তাদের অধিকাংশই দেখবে বাংলা ভূ-খন্ডের সীমানার বাইরে বহুদূর থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। তার মানে কি জানো? তার মানে হচ্ছে, বাংলায় আদি যে অধিবাসীরা ছিলেন রাজক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। তারা ছিলেন সাধারণ। প্রতিকূল প্রকৃতি আর হিংস্র জীব-জন্তু হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে জীবন ধারণ করাই ছিল তাদের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা অঞ্চলে তাই যখনই কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসা এলিট/অভিজাত প্রশাসক অথবা উচ্চাভিলাষী কোনো যোদ্ধা। প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের গোটা সময়কালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত, তুরস্ক, পারস্য (ইরান), উজবেকিস্তান এবং পরবর্তীকালে ইউরোপ ও পাকিস্তানের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত কতিপয় উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণী বাংলা অঞ্চলকে বারবার দখল ও আধিপত্য বিস্তার করেছে। দখলদারদের নিয়োজিত সভাকবি বা ইতিহাসবিদদের লিখে যাওয়া বিবরণ অনুসরণ করে বর্তমানেও এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদ ঐ সকল দখলদারেরই 'শ্রেষ্ঠত্ব' আর 'গৌরব'-এর ইতিহাস রচনা করে চলেছেন, যেখানে বাংলা ভূ-খন্ডের সাধারণ মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই অনুপস্থিত। এইসব তোমরা যখন বড় হয়ে আরও বিস্তার এক পরিসরে ইতিহাস পড়বে, তখন জানতে পারবে। বুঝতে পারবে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলিট শ্রেণীর অল্প কিছু মানুষ কীভাবে বারবার এই ভূ-খন্ডের সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় মেতেছিল। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির ইতিহাস।

অন্যে যা দাঁড়িয়ে খুশি আপার কাছে জানতে চাইলো, প্রাচীনকালে বাংলা ভূ-খন্ডে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির বাইরে আর কোনো ধর্ম কি ছিল? উত্তরে খুশি আপা বললেন, তোমাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা বলেছি। আমাদের ভূ-খন্ডের সাধারণ মানুষেরা লোকজ ধর্মের চর্চা করতেন তাও তোমরা জেনেছো। এইবার চলো, আরও একটি জনপ্রিয় ধর্ম-সংস্কৃতির কথা সংক্ষেপে জেনে নেই। এটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। এটিও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং এর রয়েছে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক দিক। ৬০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। দেব, পাল এবং চন্দ্র রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাল বংশ প্রায় চারশো বছর বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই সময় বাংলা অঞ্চলে অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারে প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মসহ অন্যান্য শাস্ত্র শিখানো হতো। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতিকে বাংলা অঞ্চলের নগরে বসবাসকারী মানুষ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শুরু করে। এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার আদি লোকজ ধর্মচর্চার নানাবিধ দিক বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তরিত অনেকগুলো ধারা চালু হয় যা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আলাদা। বাংলা অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা বিভিন্ন দেবদেবী ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতো। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর এবং মূর্তি



পূজার নিয়ম ছিল না। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে দেখা যায়, নতুন ধর্ম সংস্কৃতি যখনই বাংলায় এসেছে, বাংলা অঞ্চলের মানুষ তা নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে এবং নতুন ধর্ম-সংস্কৃতির পাশাপাশি হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো যখনই বাংলায় প্রবেশ করেছে, ধর্মের কঠোর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা এবং লোকজ রীতি-নীতি গ্রহণ করে এটিকে লৌকিক ধর্মে রূপদান করেছে।

পালদের পর একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের দাক্ষিণাত্য থেকে আসা সেন রাজারা বাংলা অঞ্চল দখল করে নেয়। প্রাচীনকালে বিজয়সেন-ই প্রথম রাজা যিনি বাংলার গোটা অঞ্চলকে একত্রিত করে শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী সেন রাজারা একদিকে যেমন ধর্মীয় কঠোরতা আরোপ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রচনা করেছিলেন। সেন যুগে তাই বাংলার নগর জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের গৌড়ামি ও কঠোরতা আরোপের ফলে গ্রামীণ জীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সামাজিক বিপ্লবের জন্ম হয়। এই বিপ্লবে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধদের একটি অংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

১২০৪ সাধারণ অব্দে বাংলার পশ্চিম অংশে আবারো নতুন একটি রাজশক্তির উত্থান হয়। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত একজন উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা আমাদের বাংলা অঞ্চলের বৃহত একটি অংশ দখল করে নেন। তিনি হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। কয়েকটি বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে নদীয়া ও গৌড় দখলকারী বখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশ। লখনৌতিতে স্থাপিত হয় তাদের রাজধানী। খলজি রাজাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ছিল বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। খলজি যোদ্ধা এবং রাজারা ছিলেন ইসলাম ধর্ম অনুসারী। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম এবং জনপ্রিয় লোকধর্ম-এর অনুসারী। ধীরে ধীরে পীর, সুফি, দরবেশ ও সুলতানদের প্রচারণায় ইসলাম বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুতই পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জংগলে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। এইভাবে তাদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে আরো নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার ও বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। হাজার বছর পূর্বে এই ভূমিতে প্রথম বসতি স্থাপনের সময় যে রীতি-নীতি প্রথা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষ তা কখনোই সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেনি। এই কারণেই দেখা যায় বাংলায় নানা ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ভূমির সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। চন্ডিদাস থেকে শুরু করে লালন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম- সবাই মানবতার জয়গান করেছেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চন্ডিদাস লিখেছেন,

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'!

তোমরা যখন আরও বড় হবে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কেবল রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি - সবই জানতে হবে। তোমরা দেখবে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হচ্ছে। উত্তর ভারতের সাথে চলছিল বাংলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাংলার একেকটি অংশে আলাদা রাজবংশ শাসন



করছে। বাইরে থেকে ভাগ্যান্বেষী নানা যোদ্ধা দল এসে দখল করে নিচ্ছিল বাংলা অঞ্চল। এইভাবেই কালক্রমে বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনছ। এই যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতা দখল করে নেয়। কোম্পানির লোকেরা একশো বছর বাংলা সহ ভারতবর্ষ শাসন করেছে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানিকে সরিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ রাজের অধীনে নেওয়া হয় বাংলার শাসন ক্ষমতা। ইংরেজরা প্রায় দুইশো বছর বাংলা দখল করে রাখে। পূর্বে যেসব ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা ও নানান রাজশক্তি বাইরে থেকে বাংলায় এসেছে তারা অধিকাংশ সময়েই এখানে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে গিয়েছে। এর ফলে মানুষের প্রতিবাদ ছিল কম, কিন্তু জীবনাচারে সেইসব শক্তির প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। ইংরেজরা এখানে এসে স্থায়ী হবার পরিবর্তে এই ভূমির সম্পদ আহরণে বেশি মনযোগী ছিল তারা। বেশি বেশি রাজস্ব আদায়, জোর করে সাধারণ মানুষকে দিয়ে জমিতে নীল চাষ করিয়েছে। এর ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানুষ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। এইসব বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে এক সময় ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে, পূর্ববর্তী অভিজাত ক্ষমতাবান রাজশক্তির মতো এদের সাথেও উপমহাদেশে নতুন এক ধর্ম-সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। বাংলার মানুষের মুখের ভাষায়, খাদ্যাভাসে, জামাকাপড়ে তাই ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনেককিছুই এখন সকলের কাছে পরিচিত বলে অনুভূত হয়।

শুরু থেকেই তোমরা দেখেছো, বাংলা অঞ্চলের মানুষের উপর ভূ-মধ্যসাগরের আশে-পাশের অঞ্চল, পারস্য (ইরান) এবং অন্যান্য অঞ্চলের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী দখলদারিত্ব এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাংলা অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য প্রায় সব সময়ই বহু দূরের ভূ-খণ্ড হতে আগত সুবিধাবাদী তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী নির্ধারণ করেছে। এই ভূ-খণ্ডের অনার্য ভাষা-সংস্কৃতির মানুষেরা বারবার শোষিত হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা অবস্থান করেছে তারা কেবল নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি ও সুবিধা লাভের চিন্তায় থেকেছে বিভোর। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। ক্ষমতালিপ্সু অভিজাত সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম-কে ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে পাল, সেন যুগের রাজকীয় দলিলে, সুলতান ও মোগল শাসকদের ভূমি কেনা-বেচা ও লেনদেনের দলিলে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের সরকারি দলিলপত্রে। ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ করে ফেরত চলে যায়, তখন এখানকার অভিজাত রাজনীতিবিদগণ বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে কেবল ধর্মের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভূ-খণ্ডের আদিকালীন নাম 'বংগ' হারিয়ে যায় কতিপয় এলিট রাজনীতিবিদের সুবিধাবাদী রাজনীতির অন্ধকারে। অথচ 'বংগ' নামটির হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নির্দিষ্ট একটি ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটে।

